গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ১ সংখ্যা ৩০ জুলাই, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

কেন্দ্রীয় বাজেট

‘মানবিক’ নয় দানবিক

গত চোদ্দ বছর ধরে চলে আসা আর্থিক সংস্কারকে ‘মানবিক মুখ’ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। কংগ্রেস জোট সরকারের অভিন্ন কর্মসূচিতে ‘মানবিক’ সংস্কারের যে বচন ছিল সেগুলি দেখিয়েই সিপিএম নেতারা বলেছিলেন — একটা বুর্জোয়া সরকারের কর্মসূচিতে যতটা জনস্বার্থ থাকতে পারে কেন্দ্রের সর্বসম্মত অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিতে আছে ততটাই। অথচ বাজেটে দেখা গেল তথাকথিত মানবিক কর্মসূচিগুলি রূপায়ণের জন্য যেখানে বাড়তি মাত্র দশ হাজার কোটি টাকা খাতা কলমে বরাদ্দ হয়েছে, যা শেষপর্যন্ত দেওয়া হবেই এমন কথা বলা যায় না; সেখানে একমাত্র সামরিক খাতেই বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে ১১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। বাজেটের ‘মানবিক’ দিকগুলির চেয়ে ‘দানবিক’ দিকটিতেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে কংগ্রেস জোট সরকার।

আরও লজ্জার বিষয়, বাজেটের কয়েকটি দিক, যেমন পি এফে সুদ না বাড়ানো, বিদেশি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো ইত্যাদি যেসব প্রশ্নে সিপিএম কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিরোধিতার ভাণটুকু দেখাচ্ছে, সেই বিরোধিতার তালিকায় প্রতিরক্ষা বরাদ্দবৃদ্ধির উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

কী হারে বাড়ছে প্রতিরক্ষা বাজেট

’৭৭ সালে কেন্দ্রে কংগ্রেসের টানা তিরিশ বছরের শাসনের অবসান ঘটার পর বিগত ২৮ বছরে নানা দল ও জোটের সরকার ক্ষমতায় এসেছে। সিপিএম-সিপিআইয়ের সর্মথিত সরকারও অতীতে এসেছে, আর বর্তমান

ছয়ের পাতায় দেখুন

তামিলনাড়ুর কুম্ভকোনমে ৯৩জন প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীর আগুনে পুড়ে মৃত্যুর ঘটনায় ২২ জুলাই এরাজ্যে ছাত্র শোকদিবসে ডি এস ও’র উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে বেদীতে মাল্যদান ও কলকাতায় মৌনমিছিল করা হয়

ইরাকে ভারতীয় পণবন্দীর ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্বিগ্ন কমরেড নীহার মুখার্জীর চিঠি

ইরাকের স্বাধীনতা যোদ্ধাদের একটি গোষ্ঠী কর্তৃক তিনজন ভারতীয়কে অপহরণের ঘটনায় এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২৩ জুলাই ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো এক চিঠিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ঐ চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ‘‘অন্তর্যামী, তিলক রাজ এবং শুকদেব সিং নামে তিন ভারতীয়কে ‘মার্কিন সেনাবাহিনীর জন্য মালপত্র, অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক সাজসরঞ্জাম বহন করার’ অভিযোগে’’ ইরাকি স্বাধীনতাযোদ্ধাদের একটি গোষ্ঠী পণবন্দী করে রাখায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। একথা আপনার অজানা নয় যে, বিজেপি পরিচালিত পূর্ববর্তী এন ডি এ সরকার যখন ইরাকে মার্কিন দখলদার বাহিনীর সাহায্যার্থে ভারতীয় সৈন্য পাঠাবার পক্ষেই মনোভাব দেখাচ্ছিল, তখন তার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ একযোগে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল এবং এধরনের যে কোনও প্রচেষ্টা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি তুলেছিল। তীব্র জনরোষের সম্মুখীন হয়ে বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকার সেই সময় ইরাকে ভারতীয় সেনা পাঠাতে সাহস করেনি।

‘‘কিন্তু ইরাকি স্বাধীনতা যোদ্ধাদের হাতে বন্দী দখলদার সেনাদের কয়েকজনের মুণ্ডচ্ছেদের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর জানা গিয়েছিল যে, সরকারি সৈন্যবাহিনীর পাশাপাশি মার্কিন কর্তৃপক্ষ চুক্তির ভিত্তিতে বিপুল সংখ্যক ভাড়াটে সেনা নিয়োগ করেছে। সেইসময় একথাও জানা গিয়েছিল যে, ভাড়াটে সেনাবাহিনীর মধ্যে শত শত ভারতীয়ও আছে যাদের দেশপ্রেমিক ইরাকিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। মার্কিন নেতৃত্বে যে আগ্রাসী বাহিনী গণ-মারণাস্ত্র রাখার মিথ্যা অজুহাত খাড়া করে স্বাধীন সার্বভৌম ইরাকের ওপর একতরফা বর্বর আক্রমণ চালিয়ে সমগ্র বিশ্বের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, সেই সাম্রাজ্যবাদী দখলদারদের এইভাবে ভাড়াটে সৈন্য যুগিয়ে গোপন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাকেও ভারতবাসী প্রবল ধিক্কার জানিয়েছে।’’

কমরেড নীহার মুখার্জী বলেছেন, ‘‘এখন কেন্দ্রে সরকার বদল হয়েছে এবং আপনার নেতৃত্বে ইউ পি এ সরকারে বসেছে। অথচ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে, ভাষাগত কিছু বাগাড়ম্বর ছাড়া ইরাক সম্পর্কে নীতিগত কোন পরিবর্তনের কথা আপনার সরকার ঘোষণা করেনি। উল্টে ইরাকের পুতুল সরকারকে মুম্বইতে দূতাবাস খোলার অনুমতি দিয়ে আপনার সরকার ইরাকে ঘৃণ্য মার্কিন দখলদারিকেই কার্যত স্বীকৃতি দিয়েছে। শুধু তাই নয়, জনমতের প্রবল চাপে বুশ-প্রশাসন যখন নিজেদের মুখ রক্ষা করতে রাষ্ট্রসংঘকে এনে হাজির করল এবং এমন ভাব দেখাতে শুরু করল, যেন মার্কিন তাঁবেদার সরকার বসানো থেকে শুরু করে ইরাকের যাবতীয় বিষয় এখন থেকে রাষ্ট্রসংঘই দেখভাল করবে, তখন ভারতের বিদেশমন্ত্রী নটবর সিং মার্কিন ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মন্তব্য করলেন, ইরাকের পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে এবং তার ফলে ইরাকে সেনা পাঠানোর বিষয়টি এবার পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। নটবর সিংয়ের এই মন্তব্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানুষের মধ্যে কী প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা আপনার অজানা নয়; যেকারণে ব্যাখ্যা দেওয়ার নাম করে আপনার সরকার বিদেশমন্ত্রীর ঐ বক্তব্য থেকে খুব সূক্ষ্মভাবে সরে আসে। পরবর্তী সময়ে ইরাকের মার্কিন তাঁবেদার আলাউয়ি সরকারও ভারতসহ কয়েকটি দেশের কাছে সেনা নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। স্বভাবতই এসব ঘটনা, বিদেশি দখলদারদের কবজা থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য রক্তক্ষয়ী ভয়ঙ্কর সংগ্রামে নিয়োজিত ইরাকি দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করেছে।

আটের পাতায় দেখুন

৫ই আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবসে সমাবেশ

রানি রাসমণি রোড ● বিকাল ৪টা

প্রধানবক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড মানিক মুখার্জী

২৯ - ৩১ জুলাই

কোটেশন একজিবিশন

মহাবোধি সোসাইটি হল

(কলেজ স্কোয়ারের নিকট)

সকাল ১০টা - রাত্রি ৮টা

বীরভূমে ছাত্র আন্দোলনের জয়

মাধ্যমিকের ফল বেরনোর সাথে সাথে উচ্চমাধ্যমিকে বিগত বৎসরগুলির ন্যায় ভর্তি সমস্যা, বাড়তি ফি ও ডোনেশন আদায়ের আশঙ্কা থেকে এ আই ডি এস ও বীরভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ২৪ জুন ডি আই এবং ডি এম-এর নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন কমরেড আয়েষা খাতুন, বিজয় দলুই, লালন দাস প্রমুখ। আন্দোলনের চাপে ডি আই পরদিনই জেলার প্রতিটি স্কুলে সার্কুলার দিয়ে বাড়তি ফি ও ডোনেশন আদায় না করার জন্য নির্দেশ দেন।

এ আই ডি এস ও বীরভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে বোলপুর, মুরারই, রামপুরহাট, সিউড়ী, লাভপুর সহ বিভিন্ন ইউনিটের পক্ষ থেকে ঐ সার্কুলারের প্রতিলিপি নিয়ে প্রতিটি স্কুলে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এর ফলে জেলার অনেক স্কুল তাদের নির্ধারিত ডোনেশন ও বাড়তি ফি আদায় প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

অন্যদিকে মুরারই থানার রাজগ্রাম মহামায়া বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০০ টাকা ডোনেশন আদায় বহাল রাখার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় ডি এস ও ৫ জুলাই ক্যাশ কাউন্টার অবরোধ করে। অবরোধে স্কুলের সমস্ত ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ডোনেশন আদায় প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন।

বন্যার্তদের ত্রাণ মঞ্জুরের দাবিতে কে কে এম এস

ত্রাণমন্ত্রী হাফিজ আলম সাইরানি কোচবিহারের বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করে দুর্গত মানুষদের ক্ষোভের সামনে সাহায্য দেওয়ার কথা বললেও টিভি সাক্ষাৎকারে বলেন, আমরা ভিখারি, কেন্দ্র এই মুহূর্তে ৩০০ কোটি টাকা না দিলে কোন ত্রাণকার্য সম্ভব নয়। মন্ত্রীর এই কথা বন্যাদুর্গত মানুষদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

সাহেবের হাটের দেবেন দেবনাথ, পশারী হাটের জিতেন রায়, শ্যামল অধিকারী, চিলকিরহাটের নিতাই বর্মণরা মন্ত্রীর এই কথায় ক্ষুব্ধ। তাঁরা বুঝেছেন লড়াই ছাড়া কিছু আদায় করা সম্ভব নয়। তাঁদের লড়াইয়ের হাতিয়ার কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন। ১৫ জুলাই কোচবিহার ১নং বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দিয়ে প্রয়োজনীয় ত্রাণের দাবি জানান এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহনির্মাণের জন্য ত্রাণ মঞ্জুর, চাষীদের জন্য কৃষি সামগ্রী প্রদান, সুদহীন ঋণদানের দাবি জানান। বর্ষার আগে নদীভাঙন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে। এদিনের ডেপুটেশনে জে সি আইয়ের মাধ্যমে পাটক্রয়, বিপিএল কার্ড প্রদান, বছরে ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজ সুনিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয়। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড নৃপেন কার্যী।

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে বুদ্ধিজীবীরা

রাজ্য সরকার অবিলম্বে ১০৮নং ধারা প্রয়োগ করে বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল এবং বকেয়ার বোঝা রদ এবং জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখিত আর্জি না জানালে আগামী ২৬ আগস্ট বিদ্যুৎমন্ত্রীর দপ্তর ঘেরাও করা হবে বলে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স এ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলের নাগরিক কনভেনশন থেকে ঘোষণা করা হয়েছে।

হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অবনীমোহন সিনহা বলেন, প্রকাশ্য শুনানি করে মাশুল নির্ধারণ করার কথা, কিন্তু তা করা হয়নি। হাইকোর্টের রায়কেও কমিশন খুশিমতো প্রয়োগ করছে। আবার কমিশনেরই এক সদস্য কমিশনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এইসব থেকে পরিষ্কার যে, কমিশনে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।

বিশিষ্ট আলোক শিল্পী তাপস সেন বলেন, মাশুল স্থির করা হয়েছে একই নীতির ভিত্তিতে। পার্থক্য শুধু চালাকিতে। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা এবং দু'টি সংস্থার গ্রাহকরা যাতে মাশুলবৃদ্ধি প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে না পারে তার জন্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ক্ষেত্রে একটু বেশি ধূর্ততার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে মাত্র। এই ধূর্ততার একটি হল ৩৭৩ কোটি টাকার মাশুল বৃদ্ধি স্থগিত রাখা, যা কিনা আন্দোলন দুর্বল হলেই বাড়ানো হবে। পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপনীতি অনুযায়ী এই ৩৭৩ কোটি টাকাই বহন করতে হবে পর্ষদের গরিব মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষি গ্রাহককে। বিগত লোকসভা নির্বাচনের জনাদেশের প্রতি সম্মান দেখিয়ে যখন বহু রাজ্য কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দেবার ব্যবস্থা করেছে অথবা মাশুল কমিয়ে দিয়েছে, ঠিক তখন পশ্চিমবঙ্গে এই জনাদেশের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে কৃষিতে বিদ্যুতের দাম সব থেকে বেশি থাকা সত্ত্বেও এ বছর STWতে ৪৫২ টাকা বছরে এবং ইউনিট

তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপ নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বামফ্রন্টকে উদ্যোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে আইন পাল্টাতে হবে। নাহলে গ্রাহকদের বিক্ষোভ বিস্ফোরণের রূপ নেবে।

প্রখ্যাত ফুটবল প্রশিক্ষক অমল দত্ত বলেন, কমিশনের কাজ দাঁড়িয়েছে প্রতি বছর বিদ্যুতের দাম বাড়ানো। রাজ্য সরকারের সমর্থন না থাকলে কমিশন এ কাজ করতে পারে না। তিনি বলেন, লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ চলবে, আবার প্রতি বছর দামও বাড়বে, একাজ সমর্থন করা যায় না।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই বিশ্বায়নের পরিপূরক হিসাবে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ চালু করছে। তার ফলেই সাধারণ মানুষের মাশুল বাড়ছে, হাজার হাজার টাকার বকেয়ার বোঝা চাপছে। অন্যদিকে বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থার ক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম কমছে। রাজ্য সরকার ডিউটি কমিয়ে ও কিস্তি বাড়িয়ে প্রকৃতপক্ষে কমিশনের অর্ডারকেই মানতে বাধ্য করতে চাইছে। এটা ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছুই নয়।

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ সুজয় বসু, কবি তরুণ সান্যাল এবং লিখিত বক্তব্য পাঠিয়ে কনভেনশনের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

কনভেনশনের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন সত্যেন ভট্টাচার্য ও সমর্থন করেন অমল মাইতি। মূল প্রস্তাবে বলা হয়েছে — এই কনভেনশন মনে করে, সি ই এস সি ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রতি ১০ পয়সা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই কনভেনশন মনে করে, ইনকাম ট্যাক্স পদ্ধতিতে তৈরি স্ল্যাব যা বর্তমানে চালু রয়েছে, তাকে তুলে দিয়ে সি ই এস সি এলাকায় সাধারণ মানুষের ব্যাপক অসুবিধার সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে মাত্র এক ইউনিট বেশি খরচের জন্য স্ল্যাব পাল্টে গেলে গ্রাহককে অনেক বেশি টাকা দিতে হবে।

এই কনভেনশন মনে করে, যদি রাজ্য সরকার প্রকৃতই কমিশনের নির্দেশকে অপছন্দ করতো তাহলে এতো কথা না বলে বিদ্যুৎ আইনের ১০৮ নং ধারা প্রয়োগ করে এই জনস্বার্থবিরোধী নির্দেশ রদ করে দিত এবং সর্বনাশা বাণিজ্যিকনীতি ও পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপ নীতিকে চিরতরে পাল্টে দেবার জন্য কেন্দ্রে তাদের বন্ধু সরকারকে লিখিত আর্জি জানাতো। কিন্তু রাজ্য সরকার সে পথে না গিয়ে, মাশুলবৃদ্ধির আক্রমণে ক্ষিপ্ত জনসাধারণ যাতে রাজ্য সরকারকে এর জন্য দায়ী না করে সেইজন্য জনদরদী সেজে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে বকেয়ার কিছু কিস্তি বাড়িয়ে দেওয়া এবং সরকারি ডিউটির কিছুটা ছাড় দেবার ব্যবস্থা করে প্রকৃতপক্ষে কমিশনের এই জনস্বার্থবিরোধী নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য করতে চাইছে। এখানেই শেষ নয়। যাতে আদালতের মাধ্যমে এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয় তার জন্য কমিশনকে দিয়ে জনস্বার্থবিরোধী রেগুলেশন তৈরি করা হয়েছে। এই কনভেনশন রাজ্য সরকারের এই দ্বিচারিতার তীব্র নিন্দা করছে।

২৬ আগস্টের কর্মসূচি ছাড়াও ৮ দফা দাবির উপর ১০ লক্ষ মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহের কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে।

শহীদ নহিরুদ্দিন সেখ স্মরণ দিবস পালিত

''২০০০ সালের ১৭ জুলাই আমরা সাত হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছিলাম। শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করেছিলাম ভাঙনে বিপর্যস্ত পদ্মার ধারে। আমাদের দাবি ছিল বর্ষাকালে নদীতে পাথরের বোল্ডার না ফেলে সুনির্দিষ্ট প্ল্যানের ভিত্তিতে শুখা মরশুমে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করা হোক, বন্ধ হোক বোল্ডার ফেলার নামে দুর্নীতি। পুলিশ আমাদের দাবির জবাব দিল গুলি চালিয়ে। শহীদ হলো নহিরুদ্দিন।'' — গত ১৭ জুলাই একথাগুলি বলেন খড়িবোনা বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আব্দুল গফুর।

এদিন ছিল শহীদ স্মরণে সভা। একে একে সকলেই সমবেত হয়েছিল পদ্মার পারে, মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার খড়িবোনায়। সেখানে নহিরুদ্দিন সেখের শহীদবেদীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি প্রাণরঞ্জন চৌধুরী। সভায় বক্তব্য রাখেন শিবু সান্যাল, নন্দদুলাল সরকার, কমলকান্তি ঘোষ, সাধন রায়, খাদিজা বানু প্রমুখ। এই সমাবেশ আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানায়।

ঐ দিন সকাল ১০টায় বহরমপুরে শহীদ দিবস পালিত হয়। বক্তব্য রাখেন প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, শিবু সান্যাল, অপূর্ব ব্যানার্জী প্রমুখ। কান্দীতে স্মরণসভায় সাধারণ পথচলতি মানুষও অংশ নেন, বক্তব্য রাখেন। এছাড়া লালবাগ, ভগবানগোলা, হরিহরপাড়া, ইসলামপুর, জঙ্গীপুর, ধুলিয়ান, রাণীনগর, লোচনপুরে শহীদ দিবস পালিত হয়।

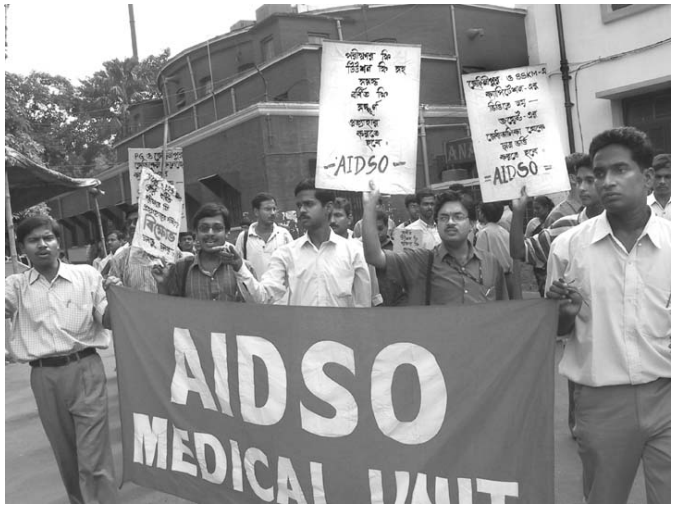

মেধার ভিত্তিতে নয়, ৯ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মেডিকেলে ছাত্রভর্তির প্রতিবাদে ২০ জুলাই কলকাতা মেডিকেল কলেজে বিক্ষোভ

পবিত্র সরকার, দিলীপ সিংহরা

সংকীর্ণ রাজনীতিরই ফসল

পবিত্র সরকারের ডক্টরেট ডিগ্রি বিতর্কের জবাবে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বারবার বলে যাচ্ছেন, এটি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়, এর মধ্যে রাজনীতি আনা উচিত নয়। আমরা সবিনয়ে অনিলবাবুকে বলতে চাই, একথা বলার আগে তাদের নিজেদের দিকে তাকানো উচিত ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও নগ্নভাবে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি যে তাঁরাই টেনে এনেছেন, একথা কি তিনি অস্বীকার করতে পারেন ? পশ্চিমবঙ্গের কোন মানুষেরই আজ অজানা নেই যে, ক্ষমতায় বসার পর থেকে সিপিএম কীভাবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে, জনমতের কোন মূল্য না দিয়ে শিক্ষাজগতের সমস্ত ক্ষেত্রে এ কাজ পরিকল্পিতভাবে করে গেছে। পবিত্রবাবু তো তাদের সেই সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতিরই ফসল। এবং শুধু একা পবিত্রবাবুই বা কেন, তাদের এই সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির ফল হিসাবে অসংখ্য পবিত্রবাবুতে আজ শিক্ষাজগত ছেয়ে আছে। এত বছর পর পবিত্রবাবুর ঘটনা আজ প্রকাশ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ায়, যাকে আর কোনমতেই গোপন করা যাচ্ছেনা, বিপদে পড়ে 'শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনীতি আনা উচিত নয়' বলে অনিলবাবু নিজেদের সমস্ত অপকর্মকে ধামাচাপা দিতে চাইছেন। আমরা অনিলবাবুকে চ্যালেঞ্জ করছি, যদি সাহস থাকে একটা যথার্থ নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করে শিক্ষাজগতে কারা সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি করেছে তার তদন্ত করুন। প্রকৃত সত্য জনসাধারণের সামনে উদ্‌ঘাটিত হোক। আমাদের বক্তব্য ব্যক্তি পবিত্রবাবুর বিরুদ্ধে যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি যে ব্যবস্থা প্রতিমুহূর্তে অসংখ্য পবিত্রবাবুর জন্ম দিচ্ছে সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

ক্ষমতা হাতে পাওয়ার সাথে সাথে একেবারে গোড়া থেকেই সিপিএম যা করেছে তা হল গোটা শিক্ষাক্ষেত্র জুড়ে দলীয় স্বার্থে সংকীর্ণ রাজনীতির ঢালাও আমদানি। সি পি এম প্রথমেই শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে স্বাধিকার কেড়ে নিয়ে দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সিন্ডিকেট সহ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত নির্বাচিত বডিগুলি, এমনকী স্কুল স্তরের নির্বাচিত কমিটিগুলি পর্যন্ত ভেঙে দেয় এবং সেইসব জায়গায় সিপিএমের অনুগত লোকদের নিয়ে এসে বসায়। এ ব্যাপারে জনমত দূরে থাক, প্রথিতযশা শিক্ষাবিদদের প্রতিবাদকেও ক্ষমতার মদমত্ততায় তারা গ্রাহ্য করেনি। বিগত ২৭ বছরে, তাদের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি নিয়োগের ক্ষেত্রে চরিত্র, সততা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত দক্ষতার চাইতেও সিপিএম তথা আলিমুদ্দিন স্ট্রীটের প্রতি নির্ভেজাল আনুগত্যই মানদন্ড বিবেচিত হয়েছে। উপাচার্য নিয়োগ হোক, কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগ হোক বা অধ্যাপক-শিক্ষক নিয়োগই হোক সর্বত্রই এ জিনিস হয়েছে। এমনকী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনগুলিতে পর্যন্ত তারা গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটা বজায় রাখে নি। অনিলবাবু কি জানেন না, বছরের পর বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন তাদের ছাত্র সংগঠন এসএফআই কীভাবে দখল করে আছে ? বিরোধী ছাত্রসংগঠনগুলিকে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে দাঁড়াতে না দিয়ে, বৈধ নমিনেশন বাতিল করে, সন্ত্রাস ও কারচুপির মাধ্যমে ইউনিয়ন দখল করে আছে এসএফআই এবং এ কাজে সাহায্য করে চলেছে তাদের দলের অনুগত অধ্যাপকরা। বাস্তবে সেখানে কোন নির্বাচনই হয় না। সংশ্লিষ্ট সকলেই জানেন, এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যদের অনেকাংশে এস এফ আই নেতারাই পরিচালনা করে। এগুলিকে কী বলবেন অনিলবাবু? রাজনীতি নয়? বামফ্রন্টের রাজত্বে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে বিপুল হারে ফি-বৃদ্ধি, ডোনেশন চালু, বেসরকারীকরণ, সেল্ফ ফিনান্সিং কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত তো শিক্ষাদপ্তরের আমলারা নেননি, অনিলবাবু বুদ্ধদেববাবুরাই নিয়েছেন — তা কি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়?

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, প্রশ্নপত্র ফাঁস, রেজাল্ট কেলেঙ্কারি, মার্কশিট জাল করা আজ রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। অনিলবাবুদের দল অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য যেসব লোকদের শিক্ষাজগতের স্তরে স্তরে বসিয়েছেন তাঁরাই আজ বেপরোয়াভাবে এইসব চালিয়ে যাচ্ছে। বামফ্রন্টের আমলে কীভাবে কেবল দলীয় আনুগত্যের মাপকাঠিতে অযোগ্য প্রার্থীকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রশ্নাতীত আনুগত্য নেই বলে যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করা হয়েছে তার উদাহরণ অনেক। ৮০ দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে রেকর্ড নম্বর পাওয়া ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট দেবাশিষ চক্রবর্তীকে নানা অজুহাতে এমনকী কলেজের লেকচারার পদেও নিয়োগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। অঘোষিত কারণ ছিল এই যে, তিনি ছিলেন এস ইউ সি আই এবং শিক্ষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। তাঁকে বঞ্চিত করে নিয়োগ করা হল সিপিএমের ধামাধরা এক নাট্যব্যক্তিত্বের কন্যাকে, যার রেজাল্ট দেবাশিষের চাইতে ছিল অনেক খারাপ। প্রসঙ্গত এই নাট্যব্যক্তিত্ব বামফ্রন্টের ধর্মতলার সভায় 'কুবুদ্ধিজীবী' 'দুর্বুদ্ধিজীবী' এবং আরও নানান গালাগালি দিয়েছিলেন ভাষা-শিক্ষা আন্দোলনের পুরোধাদের। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডি এস ও'র সংগঠক মেধাবী ছাত্র মধুসূদন করকে উপস্থিতি কম থাকার অজুহাতে এম এস সি পার্ট-টু পরীক্ষায় বসতেই দেওয়া হয়নি। মধুসূদনের আগের পরীক্ষার ফল খুব ভাল থাকায় বিভাগীয় প্রধান তাঁর আবেদনপত্র অনুমোদন করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এস এফ আই কর্মীদের চাপে উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার তাকে পরীক্ষায় বসতে দেননি। এহেন উদাহরণ খুঁজলে অসংখ্য পাওয়া যাবে।

শিক্ষার স্বাধিকারের প্রশ্নে যাঁরা শাসকদলের কাছে মাথা নোয়াননি সেই সত্যেন্দ্রনাথ সেন, সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো মানুষেরা যখন উপাচার্য ছিলেন তাঁরা কোনদিন নিজেরা রাইটার্সে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেননি। পরবর্তীকালে উপাচার্যদের সম্পর্কে এই অভিযোগ আছে যে, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা রাইটার্স বিল্ডিং-এ, কেউ কেউ আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে সময় কাটাতেই বেশি পছন্দ করতেন। অনিলবাবুদের দলের লোক না হয়েও অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য যখন আইন ও প্রথা অনুযায়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচিত হন তখন তাঁর কার্যকালের চার বছরের প্রতিটি দিন যেভাবে আলিমুদ্দিন স্ট্রীটের মদতপুষ্ট কর্মচারী সংগঠন এবং এসএফআই সদস্যরা তাঁকে হেনস্তা করেছিল, অতিষ্ঠ করে তুলেছিল — তা কি অনিলবাবুদের নোংরা দলীয় রাজনীতিরই অঙ্গ ছিল না? প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার যে সিদ্ধান্তে রাজ্যের কয়েক কোটি ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ বিপন্ন হল, তাদের সেই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ডঃ সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, প্রথমনাথ বিশী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, শৈলেশ দে প্রমুখ রাজ্যের সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীরা যখন পথে নেমেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সিপিএম-এর দলীয় নেতা থেকে শুরু করে কর্মীরা পর্যন্ত চূড়ান্ত অশালীন কটূক্তি করেননি? তাদের এই আচরণ কি শিক্ষাজগতের আঙিনাকে কলুষিত করেনি? আজ পি এইচ ডি নিয়ে পবিত্রবাবুর জালিয়াতি ধরা পড়ে যাওয়ায় অনিলবাবু এখন — ওটা শিক্ষার ব্যাপার, রাজনীতির ব্যাপার নয় — বলে গা বাঁচাতে চাইছেন।

তদন্তের সুপারিশ করবেন রাজ্যপাল

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি বিষয়ে তদন্ত করার দাবি নিয়ে ২৬ জুলাই সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ডঃ সুশীল কুমার মুখার্জীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপাল বীরেন জে শাহের সাথে দেখা করেন।

প্রতিনিধিবৃন্দ রাজ্যপালের কাছে দাবি জানানঃ (১) পবিত্র সরকার ও দিলীপ সিনহা সম্পর্কিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে; (২) রাজ্যে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষক, আধিকারিক এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ পদে সমস্ত নিয়োগে যে দুর্নীতি হয়েছে তার সার্বিক তদন্ত করতে হবে।

দীর্ঘ আলোচনায় রাজ্যপাল দুটি দাবির সাথেই সহমত হন এবং তদন্ত করার জন্য রাজ্য সরকারকে সুপারিশ করার আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দলে অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, শ্রী মানিক মুখার্জী, শ্রী তপন রায়চৌধুরী, অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী, অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক তরুণ নস্কর।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিধানসভায় অভিযোগের উত্তর সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে পবিত্রবাবুর পাণ্ডিত্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে সকলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, এরকম পণ্ডিত ব্যক্তি দেশে আর ক'জন আছে? এবং তিনি যে এই কারণে পবিত্রবাবুকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন তাও তিনি জানাতে ভোলেন নি। বুদ্ধদেববাবু কি দেশের সকলকে বোকা ভাবেন? তিনি তো ধান ভানতে শিবের গীত গাইছেন। প্রশ্ন যেখানে তাঁর পি এইচ ডি ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও সেই ডিগ্রি ব্যবহার করে তিনি দেশের মানুষকে ঠকিয়েছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চপদগুলি অধিকার করে রয়েছেন — তার জবাবে তিনি পন্ডিত কি পন্ডিত নন, এ কথা আসে কী করে। এ প্রশ্ন তো কেউ তোলেনি। প্রশ্ন উঠেছে ডিগ্রি সংক্রান্ত তাঁর জালিয়াতি নিয়ে। তাছাড়া কেউ পণ্ডিত হলেই কি তার জালিয়াতি করার অধিকার জন্মায় নাকি? নাকি পণ্ডিত লোক জালিয়াতি করলে তার কোন শাস্তি হয় না? অবশ্য সিপিএমের রাজত্বে এ ধরনের লোকদের শাস্তি হয় না একথা ঠিক — যদি তিনি সিপিএমের লোক হন। তাহলে সেটাই তাঁরা পরিষ্কার করে বলুন!

বুদ্ধদেববাবু আরও বলেছেন, এ ব্যাপারে আগস্টের পর সকলের মুখ নাকি তিনি বন্ধ করে দেবেন। অর্থাৎ তিনি মনে করছেন, তার মধ্যেই সার্টিফিকেটটা তাঁরা জোগাড় করে ফেলবেন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, তা যদি তাঁরা জোগাড় করেনও, তাহলেই কি বিগত ২৯ বছর ধরে যে মিথ্যাচার তিনি করেছেন তার অপরাধ স্খালন হয়ে যায়? উল্লেখযোগ্য যে, পবিত্রবাবু ডিগ্রি হিসাবে পি এইচ ডি ব্যবহার করলেও তিনি তা সত্যই হাতে পেয়েছিলেন কিনা তা স্মরণ করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে পবিত্রবাবুকে ইতিহাসের প্রখ্যাত অধ্যাপক মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যক্ষ প্রয়াত এ ডব্লু মাহ্‌মুদের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তাঁর গভীর জ্ঞান এবং চিন্তাশীলতার কারণে বহু সভায় যখন তাঁকে ভুল করে ডঃ এ ডব্লু মাহ্‌মুদ বলে সম্বোধন করা হত, তিনি বলতে উঠেই এর প্রতিবাদ করতেন, ''আমি এ ডব্লু মাহ্‌মুদ, ডক্টর নই। আমার নামের বাঁদিকে ডক্টর বসালে আমার মান বাড়বে না। এটা কাম্যও নয়।''

আর একজন হলেন স্বনামধন্য প্রমথনাথ বিশী। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যে উচ্চমানের গবেষণামূলক কাজ করেছিলেন তা যাঁরা জানতেন তাঁদের অনেকেই তাঁর নামের আগে ডঃ উল্লেখ করতেন। প্রমথবাবু সর্বদা তার প্রতিবাদ করে সবিনয়ে বলতেন, 'আমি ডক্টর নই। আমাকে ডক্টর বলবেন না।' মাহ্‌মুদ সাহেবের বহু সভায় পবিত্রবাবুর উপস্থিত থাকার কথা, তেমনি প্রমথবাবুকেও তিনি নিশ্চয় ভালভাবেই জানতেন। যদি এ বিষয়ে এঁদের কাছে কিছুমাত্র শিখতেন তবে বোধহয় আজ তাঁর এ দশা হোত না। এমন একজন ব্যক্তির প্রতি রাজ্যের সংস্কৃতিবান মুখ্যমন্ত্রীর যদি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর বাইরের সংস্কৃতির আবরণটাই একেবারে বেআব্রু হয়ে যায় না কি ? তদুপরি শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রী নাকি রবীন্দ্রসংস্কৃতির প্রবল অনুরাগী। আমরা তো জানি রবীন্দ্রনাথ অন্যায়কারী আর অন্যায় সহ্যকারীকে অপরাধের মাপকাঠিতে একই পংক্তিভুক্ত করেছেন। তাহলে রবীন্দ্রনাথের বিচারে বুদ্ধদেববাবু তো পবিত্রবাবুর মতোই, সমান অপরাধে অপরাধী। সত্যিকারের রবীন্দ্র অনুরাগী হলে বুদ্ধদেববাবু নিশ্চয়ই এটা মেনে নেবেন। নাহলে বুঝতে হবে, তাঁর রবীন্দ্র অনুরাগটা একটা লোকঠকানোর আবরণমাত্র। তাছাড়া, বুদ্ধদেববাবুর বক্তব্য মেনে নিলে এও মানতে হয় যে, শিক্ষকতার ক্ষেত্রে পণ্ডিত হলেই চলে, চরিত্রের দরকার হয় না। অথচ সর্বকালে সর্বদেশে শিক্ষকতা একটি মহান পেশা হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। কথাতেই আছে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। অর্থাৎ উন্নত চরিত্র ও সংস্কৃতির আধারে জাতি গঠনের কারিগর হিসাবে শিক্ষকদের ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। একদিন এ রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু পণ্ডিত নয়, আদর্শবাদী, চরিত্রবান শিক্ষকদেরও অভাব ছিল না। তাই সেদিন শিক্ষকতারও একটা মান ছিল। শিক্ষক যদি চরিত্রবান না হন তবে ছাত্রদের তিনি কী শিক্ষা দেবেন? ছাত্ররাই বা কী চরিত্র পাবে? শিক্ষা তো শুধু কোন বিষয়ে কিছু তথ্যের সমাহার নয়, শিক্ষা মানে চরিত্রও বটে। শিক্ষকের সেই মহান ভূমিকাকে আজ বুদ্ধদেববাবুরা কোথায় নামিয়ে এনেছেন? তাছাড়া যে সরকারের আমলে শিক্ষার এতগুলি উচ্চপদ দীর্ঘ বছর ধরে মিথ্যা ডিগ্রি ব্যবহার করে কেউ অলংকৃত করে

পাঁচের পাতায় দেখুন

আজও বন্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে ভাবা হল না

আসাম, বিহার, মেঘালয় ও অরুণাচল প্রদেশে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে। নিম্ন আসামের গোয়ালপাড়া, ধুবড়ি, কামরূপ জেলায় বিপদসীমার উপর দিয়ে জল বইছে। ৮,৫০০টি গ্রাম জলের তলায়। কম করে ৯৩ লাখ মানুষ গৃহহারা। এদিকে নগাঁও জেলায় ৩৭নং জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে কপিলি নদীর জল বয়ে চলেছে। আপার আসামের ডিব্রুগড়, জোরহাট, তেজপুরেও বন্যা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। বরাক উপত্যকাও প্লাবিত। আসামের ২৭টি জেলার মধ্যে ২৫টি বন্যা কবলিত, সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ২৩৯, বেসরকারি হিসাবে আরও বেশি। বিহারে ইতিমধ্যেই বন্যায় ২১০ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। মজফ্ফরপুর, সীতামারি, দ্বারভাঙ্গা, পূর্ব চম্পারণ, আড়াড়িয়া, সমস্তিপুর, মধুবনী প্রভৃতি জেলায় সরকারি হিসাবেই অন্তত ২ কোটি মানুষ বন্যা কবলিত। মেঘালয় এবং অরুণাচল প্রদেশেও বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মেঘালয়ের তিনটি জেলা, অরুণাচলের ছয়টি জেলা বন্যা কবলিত। সেখানেও বহু মানুষ মারা গেছেন।

অনুষঙ্গ হিসাবে আসে ভাঙন, যা সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে শত শত পরিবারকে। কত সচ্ছল পরিবার এক নিমেষেই হয়ে গেছে পথের ভিখারি। অথচ এই বিপর্যয় কি হঠাৎ করে এই বছরই ঘটল? বন্যা-ভাঙন তো এদেশের প্রায় বাৎসরিক ঘটনা। এই বিপর্যয় যে জনজীবনে চরম দুর্ভোগ নিয়ে আসে একথাও তো জানাই আছে। তাছাড়া যেখানেই বন্যা হোক তার আগাম আভাস আগেই পাওয়া যায়। প্রশ্ন হল, এই বিপর্যয় মোকাবিলায় কি অগ্রিম কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল? এ নিয়ে সরকারের কি কোন উদ্বেগ আছে? বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কাছে কেন অসহায়ের মত মারা যাবে? খরা-বন্যা-ভাঙন-ভূমিকম্প এসব প্রাকৃতিক ঘটনার ধ্বংসলীলা থেকে মানুষকে বাঁচানো আজ কি সত্যিই অসাধ্য?

এই সমস্যাগুলিকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে ঘোষণা করে সেগুলির মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সুচিন্তিত অভিমতের ভিত্তিতে সমাধানসূত্র বের করা যে কোন সরকারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। অথচ আজ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন কোন সরকারের পক্ষ থেকেই এই

বন্যার স্থায়ী সমাধান ও পর্যাপ্ত ত্রাণের দাবিতে পাটনায় এস ইউ সি আই-এর অবস্থান-বিক্ষোভ

সর্বত্রই বন্যাদুর্গত মানুষেরা বাড়িঘর সহায় সম্পত্তি সবকিছু হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। কোথায় থাকবে, কী খাবে কোন সংস্থান নেই, নেই একফোঁটা পানীয় জলের ব্যবস্থা। অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে ও দূষিত জল পান করে, কলেরা, আন্ত্রিক প্রভৃতি মহামারীর আকার ধারণ করেছে। কোথাও ত্রাণ বা চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। বন্যার সময় জলের তোড়ে ভেসে গেছে কত শিশু-বৃদ্ধ, বন্যার পরে মরছে আরও বেশি। শুধু মানুষই নয়, গবাদি পশুর দেহ পচে পরিবেশকে করেছে দুর্গন্ধময়। কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, জমি ঢাকা পড়ে গেছে বালির তলায়। শুধু বন্যাই নয়, বন্যারই সমস্যাগুলিকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে বন্যা-ভাঙন-খরা প্রতিরোধে সরকারের নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনাও নেই। কখনও কখনও এই সমস্ত সমস্যার প্রতিকারে ক্ষমতাসীন সরকারগুলি অনেক খরচ করে লোক দেখানো কমিশনও বসায়। কিন্তু কমিশনের সেই সমস্ত সুপারিশ ফাইলেই চাপা পড়ে থাকে। বন্যা যখন হয়, যখন চারদিকে হৈ চৈ পড়ে, প্রধানমন্ত্রী বা ত্রাণমন্ত্রী আড়মোড়া ভেঙে আকাশ পথে আসেন, স্ফীত জলরাশির সৌন্দর্য উপভোগ করেন, সেই জল যে কত মায়ের কোল শূন্য করে দেয় সেই আর্তনাদ তাঁদের কাছে পৌঁছায় না। এই অসহায় মানুষদের কাছে একটা ত্রিপল পৌঁছে দেওয়া, একটু খাবার, একফোঁটা পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে পর্যাপ্ত ত্রাণ তহবিল দরকার কেন্দ্রীয় সরকার তার কতটুকুই বা দেয়? আবার যতটুকু মঞ্জুর হয় তা নিয়েও চলে শাসকদলের নির্লজ্জ দলবাজি ও হৃদয়হীন দুর্নীতি। সাধারণ মানুষের জোটে কেবলই দুর্ভোগ।

বন্যার ত্রাণ সংগ্রহে এস ইউ সি আই কর্মীরা — পাটনা (বাঁদিকে) ও কলকাতায়

এবারেও এই ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে অসংখ্য মানুষ যখন গৃহহারা, প্রতিদিন মারা যাচ্ছেন, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের কী ভূমিকা দেখা গেল? প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং গৌহাটি গেলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে উপর্যুপরি বন্যার প্রেক্ষাপটে কী করণীয় তা নির্ণয় করতে 'টাস্ক ফোর্স' গঠন করেই তাঁর দায়িত্ব সারলেন। পর্যাপ্ত ত্রাণের জন্য আসাম সরকারের দাবিকেও যথাযথ গুরুত্ব দিলেন না। কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়ে ত্রাণের পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে — এসব বলে যা করা উচিত ছিল যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তাকে বিলম্বিত করে দিলেন। এটা শুধু এবারের ঘটনাই নয়, কেন্দ্রে এযাবতকাল যত সরকার ক্ষমতায় বসেছে, মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় তাদের যত তৎপরতা দেখা গেছে, সাধারণ মানুষের জীবনরক্ষায় দেখা গেছে তারা ততটাই উদাসীন, নিষ্ক্রিয়। এ নিয়ে যদি তাদের বিন্দুমাত্রও উদ্বেগ থাকত তাহলে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করে তা কার্যকরী করা হত। স্বাধীনতার পর ৫৭টি বছর এভাবে পার করে দেওয়া হত না।

এমনকী খরা-বন্যা-ভাঙন মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন বামপন্থীদের ভূমিকাও কম নিন্দনীয় নয়। কয়েকদিন আগে উত্তরবঙ্গে বন্যা কবলিত এলাকা দেখতে গিয়ে ত্রাণমন্ত্রী হাফিজ আলম সাইরানি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করার পরিবর্তে এক টিভি সাক্ষাৎকারে বললেন, 'আমরা ভিখারি, এই মুহূর্তে কেন্দ্র ৩০০ কোটি টাকা না দিলে আমাদের কিছু করার নেই।' অথচ কেন্দ্রের বন্ধু সরকারের কাছ থেকে আবেদন করেই হোক আর আন্দোলন করেই হোক, ত্রাণ মঞ্জুর করাতে তাঁরা কি সেই উদ্যোগ নিচ্ছেন ? অন্যদিকে বিজেপি সরকার পাঁচটি বছর মন্দির আর দাঙ্গা নিয়েই ব্যস্ত থাকল! খরা-বন্যা-ভাঙন সমস্যা সমাধানে কোন উদ্যোগ নিল না। আগে যাঁরা ধর্মচর্চা করতেন, তাঁরা মানুষের দুর্যোগে পাশে দাঁড়াতেন। মানবতাবাদীরা তো দাঁড়াতেনই। মানুষের প্রতি ভালবাসা না থাকলে, তার দুঃখ-বেদনার জ্বালা নিজে অনুভব না করলে, তাদের সমস্যায় ব্যথিত না হলে প্রতিকারের পথ কেউ দেখতে পায় না। কেন্দ্রে বা রাজ্যে রাজ্যে আজ যারা ক্ষমতায় আছে, তারা কী নিয়ে ব্যস্ত? তারা ব্যস্ত গদি আর গদির স্থায়ীত্ব নিয়ে। জনগণের সমস্যার কথা ভাবার তাদের সময় কোথায়?

আবার মনে রাখা দরকার, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামনে পড়ে অসহায়ের মত হা-হুতাশ না করে জনসাধারণেরও কিছু করণীয় আছে। এই সমস্যাকে যাতে 'জাতীয় সমস্যা' হিসাবে ঘোষণা করা হয় সেই দাবিতে জনগণকে এগিয়ে এসে এলাকায় এলাকায় 'বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি বা 'প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা কমিটি' গড়ে তুলে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মিটিং, মিছিল, আলোচনা, কনভেনশন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই সমস্যাগুলি মোকাবিলায় সরকারের কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত — সেই মর্মে একদিকে জনসাধারণকে সচেতন করা, অন্যদিকে সরকার সেগুলিকে কার্যকরী করার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাতে বাধ্য হয় তার জন্য সংগঠিত জনআন্দোলনের চাপ সৃষ্টি করা জরুরি প্রয়োজন।

বিগত ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে পশ্চিমবঙ্গের নয়টি জেলায় যে বিধ্বংসী বন্যায় হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল, সরকারের যে চরম অমানবিকতা ও অবহেলায় বন্যা এমন বিধ্বংসী রূপ নিয়েছিল, তারই প্রতিবাদে এবং বন্যায় প্রাণ হারানো মানুষদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ওই বছর ২৪ অক্টোবর আমাদের দলের ডাকে সারা রাজ্যে শোকদিবস পালন করা হয়েছিল। সেদিন শোকপ্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ''এই শোক আমাদের যা করতে বলে তার প্রতি আমরা দায়বদ্ধ।' সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমাদের দল এস ইউ সি আই জনসাধারণকে যুক্ত করে খরা-বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধে সাধ্যমত আন্দোলন করে যাচ্ছে। জনসাধারণের মধ্যে প্রচারাভিযান চালাচ্ছে, আন্দোলনের কমিটিগুলি গড়ে তুলছে, এবং তাকে ভিত্তি করে আন্দোলন

পাঁচের পাতায় দেখুন

প্রবীণ পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

সত্তরোর্ধ্ব প্রবীণ কমরেড অক্ষয় সাঁতরা বার্ধক্যজনিত নানা রোগে কয়েক বছর অসুস্থ থাকার পর গত ১২ জুন বেলা ১১-৪৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

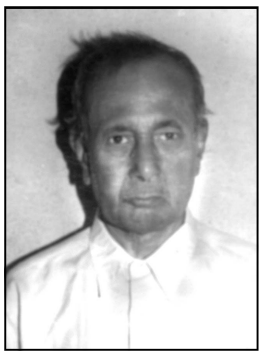

পঞ্চাশের দশকের উত্তাল গণআন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বেহালা অঞ্চলে পার্টির সংগ্রামী ভূমিকায় আকৃষ্ট হয়ে ১৯৫৪ সালে কমরেড অক্ষয় সাঁতরা দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ওই অঞ্চলে পার্টির নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন গড়া ও পরিচালনায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন। সিন্থেটিক মোল্ডার্স (প্লাস্টিক কারখানা) ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, প্রমোদ গস (পটারি কারখানা) ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইস মিল (ধান কল) ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠন ও পরিচালনায় এবং '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে কমরেড অক্ষয় সাঁতরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

বয়সের ভার ও অন্যান্য নানা কারণে দলের কাজে যখন সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেননি, তখনও তিনি পার্টির অগ্রগতির খোঁজ খবর সর্বদা নিতেন এবং আন্দোলনে দলের সাফল্যে, সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধিতে আনন্দিত হতেন।

তাঁর মৃত্যুতে পার্টি একজন প্রবীণ সংগ্রামী কমরেডকে হারাল।

কমরেড অক্ষয় সাঁতরা
লাল সেলাম

অভিবাসী শ্রমিকদের পাশে দক্ষিণ কোরিয়ার ছাত্র ও শ্রমিকশ্রেণী

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে মিয়োংডন ক্যাথিড্রাল চার্চের বিশাল প্রাঙ্গনটি এখন আশ্রয়চ্যুত হাজারখানেক অভিবাসী শ্রমিকের অস্থায়ী আস্তানা। এই শ্রমিকরা দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অনশন ধর্মঘট চালাচ্ছেন। সরকারের 'এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম' সংক্ষেপে ই পি এস নামে একটি নতুন আইনবলে গত ১৫ নভেম্বর থেকে ধরপাকড় শুরু করে পুলিশ। ধরপাকড় চালাতে গিয়ে পুলিশ শ্রমিকদের ঝুপড়িগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ায় অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ৪ লক্ষ। এরা প্রধানত এসেছে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ থেকে।

ইপিএস আইনে বলা হয়েছে, একজন অভিবাসী শ্রমিককে চার বছর কাজ করার পর ছুটি নিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে স্বদেশে ফিরতে হবে। তারপর ইচ্ছে করলে সে পুনরায় দক্ষিণ কোরিয়ায় ফিরে এসে নতুন করে নাম রেজিস্ট্রি করে পুরানো কর্মস্থলেই যোগ দিতে পারবে, তবে চার বছর ধরে কাজ করে আসার দরুণ যে মজুরি সে পেত তা পাবে না। নতুন মজুরিতেই তাকে নতুন করে কাজে যোগ দিতে হবে।

এমনিতেই অভিবাসী শ্রমিকরা আই এল ও (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা) স্বীকৃত ন্যূনতম মজুরি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন শিল্পে বার্ষিক ছুটিছাটা ছাড়া নামমাত্র মজুরিতে অভিবাসী শ্রমিকদের উদয়াস্ত খাটানো হয়। নিয়োগকর্তারা এদেরকে পুরো শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত না করে 'ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি' হিসাবে নিয়োগ করে। 'ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রেনি' সংক্রান্ত আইনে বলা আছে, দৈনিক আট ঘণ্টা ডিউটির মধ্যে এরা চার ঘণ্টা হাতেকলমে কাজ করবে, তার জন্য যথাযোগ্য মজুরি দেওয়া হবে। বাকি চার ঘণ্টা এরা স্টাডি (পড়াশুনা) করবে, এর জন্য কোন মজুরি দেওয়া হবে না। বাস্তবে অভিবাসী শ্রমিকদের চার ঘণ্টার মজুরিতে দৈনিক ১২/১৪ ঘণ্টা খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আশির দশকে 'টাইগার ইকনমির' দেশ হিসাবে পরিচিত দক্ষিণ কোরিয়ায় পুঁজিপতি মিলমালিকদের হঠাৎ করে ফুলেফেঁপে ওঠার পেছনে অভিবাসী শ্রমিকদের এহেন শোষণ অনেকাংশে কাজ করেছে।

কিন্তু হঠাৎ করে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার ই পি এস আইন আনতে গেল কেন? কারণ সেখানে বেকারত্ব তীব্রতর হচ্ছে। কর্মচ্যুতি হচ্ছে। এই বেকারত্বের জন্য অভিবাসী শ্রমিকদের দায়ী করে তাদের বিতাড়িত করতেই এই ই পি এস আইন পাশ করায় প্রেসিডেন্ট রোমূলহাইর উরি সরকার।

স্মরণে থাকতে পারে যে, দ্রুত শিল্পায়নের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মসংস্থানের অপেক্ষাকৃত সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং শিল্পে শ্রমিকের চাহিদা বাড়তে থাকে। অন্যদিকে, মজুরিবৃদ্ধি ও কর্মস্থলে উন্নত পরিবেশের দাবিতে দক্ষিণ কোরিয়া জুড়ে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। এ অবস্থায় সস্তা শ্রমিকের খোঁজে দক্ষিণ কোরিয়ার ছোটবড় শিল্প মালিকদের নজর পড়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলি এবং পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যগুলির ওপর। এদেশগুলিতে পুঁজিবাদের অসম শিল্পবিকাশ ও তীব্র শোষণজনিত কারণে সৃষ্ট লক্ষ লক্ষ কর্মচ্যুত ও বেকারবাহিনী এবং পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যগুলিতে পুনরায় পুঁজিবাদ ফিরে আসার জন্য সৃষ্ট লক্ষ লক্ষ বেকার চাকরির সন্ধানে দক্ষিণ কোরিয়ায় পাড়ি জমায়।

দক্ষিণ কোরিয়ার সংবাদপত্রগুলি এবং শ্রমিক নেতারা হিসেব কষে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ই পি এস বলবৎ হবার পর অভিবাসী শ্রমিকদের একটানা কাজে ছেদ ঘটিয়ে এবং নতুন করে কাজ শুরুর ফাঁকে একেকজন শিল্পমালিক গড়ে আড়াই লক্ষ ডলার অর্থ অতিরিক্ত বার্ষিক মুনাফা হিসাবে পকেটস্থ করবে।

বামপন্থী শ্রমিক ও গণআন্দোলনের ফলে দক্ষিণ কোরিয়ায় এতকাল উগ্র জাতিবিদ্বেষ বাসা বাঁধতে পারেনি। কিন্তু '৯০-র দশকে বিশ্বায়ন ও প্রাইভেটাইজেশনের ধাক্কায় অন্যসব পুঁজিবাদী দেশের মতো দক্ষিণ কোরিয়াতেও বেকারি ও কর্মচ্যুতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অবস্থার জন্য দক্ষিণপন্থী দলগুলি অভিবাসী শ্রমিকদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তোলা শুরু করে এবং ভোট বৈতরণী পার হবার জন্য এটাকেই নির্বাচনী ইস্যু করে। প্রেসিডেন্ট রোমূলহাই-র উরি সরকারও ভোটের কথা মনে রেখে গত বছরের জুলাই মাসে সংসদে বিপুল ভোটাধিক্যে আইনটি পাশ করিয়ে নেয়।

ই পি এস আইন বলবৎ হবার পর অভিবাসী শ্রমিকদের বলপূর্বক দেশে ফেরত পাঠাবার জন্য পুলিশ ১৫ নভেম্বর থেকে অভিবাসী শ্রমিকদের ধরপাকড় চালাতে শুরু করে। ধরপাকড় চালাতে গিয়ে অভিবাসী শ্রমিকদের বহু অস্থায়ী আস্তানা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। বহু অভিবাসী শ্রমিক কাজ-কাম হারায়। দেশে ফেরত যাবার অর্থের অভাবে ও অনাহারক্লিষ্ট হয়ে গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে এ বছরের মে মাসের মধ্যে ১১ জন অভিবাসী শ্রমিক আত্মহত্যা করেছে। অন্যদিকে অভিবাসী শ্রমিকদের আরেকটা অংশ (সংখ্যায় ১,৩০,০০০) ইকুয়ালিটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের দানবীয় আইন ই পি এস-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে নেমে পড়েছে। প্রথমদিকে মিছিল-মিটিং-সমাবেশের মধ্যে এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। আন্দোলনের পরবর্তী ধাপে অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের বিভিন্ন অস্থায়ী আস্তানায় অনশন ধর্মঘট শুরু করেছে। অনশন ধর্মঘট শুরু হবার পর দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক সংগঠন 'কোরিয়ান কনফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস্' (KCTU) অভিবাসী শ্রমিকদের আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। চাকরির দাবিতে ও কোরিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের দাবিতে কোরিয়ান যুবশক্তি ইতিমধ্যেই সেখানে যে আন্দোলন চালাচ্ছে, অভিবাসী শ্রমিকদের আন্দোলন তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার ছাত্ররাও পিছিয়ে নেই। অনাহারক্লিষ্ট, কর্মচ্যুত ও গৃহহীন অভিবাসী শ্রমিকদের খাওয়ানো-পরানো, থাকার ব্যবস্থা করা এবং পুলিশি ঝামেলা থেকে অনশন-ধর্মঘটরত অভিবাসী শ্রমিকদের বাঁচানোর সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার ছাত্র সমাজ।

"দুনিয়ার শ্রমিক ও শোষিত মানুষ এক হও", এ স্লোগানটি আজ দক্ষিণ কোরিয়ার মাটিতে এভাবেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। (ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, নিউ ইয়র্ক, ৩-৬-২০০৪)

বন্যা-ভাঙন

চারের পাতার পর

করছে। গত ৪ জুলাই কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে এই কমিটির সারা বাংলা কনভেনশনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনকে এমন স্তরে আজও উন্নীত করা সম্ভব হয়নি যার দ্বারা সরকারের উপর কার্যকরী চাপ সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাতে বাধ্য করানো যায়। এই অবস্থায় জনসাধারণকে এগিয়ে এসে সংগঠিত হয়ে আন্দোলনে সামিল হতে হবে, আন্দোলনের গতি তীব্রতর করতে হবে। একমাত্র এ পথেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ যেকোন সমস্যার সমাধানে সরকারকে কিছুটা হলেও উদ্যোগী করানো সম্ভব এবং সমস্যার সুরাহা সম্ভব।

গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা

শিশুসৈন্যদের পাঠিয়েছিল কামানের খাদ্য হিসাবে

'গণতন্ত্র', 'মানবাধিকার', 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' নিয়ে ধনতান্ত্রিক দুনিয়া বিশেষত সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের দুই শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রনায়কদের হামেশাই খুব বাগাড়ম্বর করতে দেখা যায়। এদের নিপুণ ও সুপরিকল্পিত প্রচারের দ্বারা অনেকের মধ্যে এমন ধারণাও তৈরি হয়েছে যেন বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে প্রশংসিত আমেরিকা ও ইংল্যান্ড মানবাধিকারের স্বর্গরাজ্য। শিশুদের জন্য এরা কত জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেয়, শিশু শ্রমের নিন্দায় মুখর হয়। এর আড়ালে কী বর্বর শাসনব্যবস্থা এরা চালায়, তার একটি নমুনা দেখা যাক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কমবয়সী তরুণ যুবকদের দলে দলে সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করার বিষয়ে সম্প্রতি ইংল্যান্ডেই এক তদন্তমূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, যাতে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গিয়ে ওদেশের শাসকরাও যে কতটা নিষ্ঠুর বিবেকহীন হতে পারে, নিজেদের আইনকে নিজেরাই পদদলিত করতে পারে তা বোঝা যায়। 'দি টাইমস' পত্রিকায় মাইকেল ইভানস 'ডুমড্ ইউথ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সরকার স্কুল-পড়ুয়া ছাত্রদের মধ্য থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ শিশু সৈন্য সংগ্রহ করে বিপক্ষের কামানের খাদ্য হিসেবে পাঠিয়েছিল। এই আড়াই লক্ষ কিশোরের সকলেরই বয়স ছিল আঠারোর নীচে। চোদ্দ বছর বয়সের বালকও ছিল অনেক। এদের সকলের ক্ষেত্রেই কারচুপি করে বয়স বেশি দেখিয়ে সৈন্যদলে নামে লেখানো হয়েছিল। এদের সকলেই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, এবং আব্রাহাম বেভিস্টাইন নামে এক সতেরো বছরের কিশোরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসার 'অপরাধে' ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। বেভিস্টাইন প্রথম বার যুদ্ধে গিয়েই গ্রেনেডে মারাত্মক আহত হয়। চিকিৎসার পর সেরে উঠলে সে আর যুদ্ধে যেতে চায়নি। কিন্তু তাকে জোর করে রণাঙ্গণে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে পালিয়ে এলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। চোদ্দ বছরের ছোট্ট ছেলে হোরেস আইলসকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হলে তার দিদি তাকে চিঠিতে লিখেছিল, 'ভাই, তুমি ওদের তোমার বয়সের কথা বল। ওরা নিশ্চয়ই তোমায় ছেড়ে দেবে।' কিন্তু চিঠি পৌঁছানোর আগেই যুদ্ধের প্রথম দিনেই হোরেসের মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হিটলারের নাৎসি জার্মানিতে দেশের ছেলেদের বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করা, নাগরিকদের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত করা ইত্যাদির কথা সকলেই জানেন। কিন্তু তার বহু আগে ১৯১৪ সালেই গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধ্বজাধারীরা কীভাবে নিজেদেরই আইন পদদলিত করে স্কুল-পড়ুয়াদের যুদ্ধক্ষেত্রে ঠেলে দিয়েছিল ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। আরও বিস্ময়কর যে, তরুণদলকে নির্বিচারে যুদ্ধে পাঠানোর ব্যাপারে যে বয়সের সীমা লঙ্ঘন করা হচ্ছে — এই অভিযোগ তুলে আর্থার মার্কহ্যাম নামে জনৈক এম পি সে দেশের যুদ্ধ দপ্তরের কাছে বালক সৈন্যদের যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সমরনায়ক লর্ড কিচেনারের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্রিটিশ সমরদপ্তর মার্কহ্যামের অভিযোগ সুকৌশলে ধামাচাপা দিয়ে দেয়। (সূত্র ঃ দি স্টেটসম্যান ১৫ জুন, '০৪)

সংকীর্ণ রাজনীতির ফসল

তিনের পাতার পর

থাকেন সেই সরকারের যোগ্যতা সম্পর্কেও তো প্রশ্ন এসে যায়। সেই সরকারের আর একদিনও ক্ষমতায় থাকার অধিকার থাকে কি?

কেউ কেউ বলছেন যে, পবিত্রবাবু জালিয়াতি করে রাজ্যে শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করেছেন। বলা ভাল যে, গত ২৭ বছর ধরে সিপিআইএম শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের একচ্ছত্র দলীয় আধিপত্য কায়েম করতে দলবাজি, দুর্নীতি, স্বজনপোষণের যে বিষবৃক্ষটি লালন-পালন করে বড় করে তুলেছে, পবিত্র সরকার-দিলীপ সিংহরা সেই বিষবৃক্ষেরই ফল। তাই, জালিয়াতির জন্য পবিত্রবাবুর যথাযোগ্য শাস্তি পাওয়া উচিত ঠিকই, কিন্তু এক পবিত্র সরকারকে সরালেও জালিয়াতের জঙ্গল সাফ হবে না। আরও বহু পবিত্রবাবুই শিক্ষার অঙ্গন অপবিত্র করে বসে থাকবেন। এবং সিপিএমের হীন দলবাজির পথে আগামী দিনে আরও অসংখ্য পবিত্র সরকারের জন্ম হবে, যদি না যে নিকৃষ্ট রাজনীতির ফল হিসেবে এঁদের জন্ম সেটিকে সমূলে বিনাশ করা যায়। কারণ যে কোন উপায়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার যে রাজনীতির ফলে সমাজের অন্য ক্ষেত্রে দুলাল ব্যানার্জী, তারকেশ্বর লোহার, বুল্টনরা তৈরি হয়েছে, সেই রাজনীতিতেই শিক্ষাক্ষেত্রে পবিত্র সরকাররাও তৈরি হয়েছে। আজ প্রয়োজন এই দুষ্ট রাজনীতিকেই পরাস্ত করা।

সামরিক বাজেট

একের পাতার পর

সরকারের ক্ষেত্রে সিপিএম 'নির্ধারক' ভূমিকায় রয়েছে। এসব সরকারগুলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একে অপরের বিরুদ্ধে যাই-ই বলুক বা ভোটের স্বার্থে জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতিই দিক, যারাই ক্ষমতায় বসেছে তারাই সামরিক বাজেট বাড়িয়েছে। কীভাবে এই বাজেট বাড়ানো হয়েছে, নীচে তার সংক্ষিপ্ত চিত্র দেওয়া হল —

প্রতিরক্ষা বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

'৯০-'৯১	১৫,৪২৬
'৯৯-'০০	৪৫,৬৯৪
'০০-'০১	৫৮,৫৮৭
'০৩-'০৪	৬৫,৩০০
'০৪-'০৫	৭৭,০০০

অর্থাৎ গত ১৫ বছরে প্রতিরক্ষা বরাদ্দ বেড়েছে ৫ গুণেরও বেশি। এছাড়াও ইদানীংকালে সামরিক ব্যয় কমিয়ে দেখাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত খরচ অন্য খাতে দেখায়, যেমন— বি এস এফ, সি আর পি এফ, উপকূল রক্ষী বাহিনী প্রভৃতি আধাসামরিক বাহিনীর খরচ, সেনাবাহিনীর পেনসনের খরচ, সীমান্ত এলাকায় পথঘাট নির্মাণ, বিদ্যুতের ব্যবস্থা প্রভৃতি। এগুলি বাস্তবে সামরিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হলেও এগুলি সামরিক ব্যয় হিসাবে দেখানো হয় না। এছাড়াও বিজ্ঞানপ্রযুক্তি, পরমাণু ও মহাকাশ গবেষণা খাতে ব্যয়বরাদ্দও বাস্তবে ছদ্মবেশে সামরিক বরাদ্দ। কারণ, এসব গবেষণার একটা বড় অংশ অস্ত্রনির্মাণ ও ক্ষেপণের ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ, সরাসরি প্রতিরক্ষা বরাদ্দ বলে যা দেখানো হয়, প্রকৃত ব্যয় তার চেয়ে অনেক বেশি। এ ধরনের খাতে কত ব্যয় হয়, প্রতি বছর বাজেট ভাষণে তার উল্লেখ থাকে না। যেমন এবছরই তা বলা হয়নি।

সামরিক ব্যয়ের পিছনে সরকারি অজুহাত

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, আমাদের মতো গরিব দেশে বাজেটের একটা বড় অংশ সামরিক খাতে খরচ করা হচ্ছে কেন? সঙ্গে সঙ্গে সরকারি তরফে উত্তর আসে, দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে কোন আপস চলতে পারে না। গণদাবী, ১৬ জুলাই, ৫৬ বর্ষ ৪৭ সংখ্যায় বাজেট সম্পর্কে আলোচনায় আমরা বিশদভাবে দেখিয়েছি যে, ''দেশের নিরাপত্তা'' কথাটা একটা লোকঠকানো বুলি, আসলে ভারতবর্ষের শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকেই তারা জনগণের নিরাপত্তা বলে চালাতে চাইছে এবং তার দ্বারা রাষ্ট্রের দমনমূলক হাতিয়ার সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার পিছনে জনসমর্থন জড়ো করছে।

যদি জনগণের নিরাপত্তা নিয়ে সরকার সত্যিই চিন্তিত হতো, তবে সর্বাগ্রে অনাহার, অপুষ্টি এবং যক্ষা, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, কালাজ্বরের মতো প্রতিরোধ্যযোগ্য রোগের হাত থেকে জনগণকে বাঁচাবার চেষ্টা করত। অতীতে বহু সমীক্ষাই দেখিয়েছে, অপুষ্টি ও প্রতিরোধযোগ্য রোগে এদেশে যত মানুষ প্রতি বছর মরে, যুদ্ধে তা মরে না।

সামরিক ব্যয় বাড়ানো হচ্ছে কেন?

সামরিক ব্যয়ের এই বিপুল বৃদ্ধির পিছনে প্রধানত তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, সামরিক ব্যয় বাড়িয়ে কৃত্রিমভাবে চাহিদা সৃষ্টি করে চরম সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখা। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় পুঁজিবাদের সম্প্রসারণবাদী স্বার্থে প্রতিবেশী দেশগুলির উপর পরোক্ষে উন্নত সামরিক ধমকি বা চাপ বজায় রাখা অর্থাৎ আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা। তৃতীয়ত, সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্র কেনাবেচায় অকল্পনীয় দুর্নীতি। আগে 'গণদাবী'তে বাজেট আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, বাজার সঙ্কটে জর্জরিত পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে কৃত্রিমভাবে চাঙ্গা করতে সরকার অর্থনীতির সামরিকীকরণ করছে। সকলেই জানেন, বিশ্বপুঁজিবাদের অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতিরও মূল সঙ্কটটাই হল চাহিদার সঙ্কট। দেশের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই কর্মহীন, আর যাঁরা চাকুরি করেন তাদের বেশিরভাগই অতি অল্প মজুরি পান। তাই অধিকাংশ মানুষই প্রয়োজন থাকলেও পয়সার অভাবে পণ্য কিনতে পারেন না, এমনকি ন্যূনতম খাদ্যটুকুও সংগ্রহ করতে পারেন না। ফলে কৃষি ও শিল্প, উভয়ক্ষেত্রেই উৎপাদিত পণ্য বিক্রি না হয়ে জমে যায়। এর ফলে বাজারে যে সঙ্কট দেখা দেয়, সরকার সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু নিজেই কিনে কৃত্রিমভাবে বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করে। এই চাহিদা কৃত্রিম কেন? কারণ কৃষি শিল্প প্রভৃতি উৎপাদনমূলক কাজের দ্বারা জনগণের আয়বৃদ্ধি এবং তার ফলে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা চাহিদাবৃদ্ধি এটা নয়। এক্ষেত্রে সরকার নিজস্ব তহবিলের, অর্থাৎ জনগণের টাকা ঢেলে কৃত্রিমভাবে চাহিদা বাড়ায় বলে যতক্ষণ টাকা ঢালে এবং যতটা টাকা ঢালে মূলত বাজার ততক্ষণ এবং ততটুকুই বাড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বিশ্বপুঁজিবাদের সঙ্কটের নতুন বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে স্ট্যালিন দেখান — বিশ্বপুঁজিবাদের সঙ্কট এখন আর অতীতের মতো বাজার কখনো তেজি কখনো মন্দা — এইভাবে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে আসছে না। এখনকার মন্দা হল স্থায়ী একটানা মন্দা। স্ট্যালিনের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ সুস্পষ্টভাবে দেখান — এই স্থায়ী সঙ্কট থেকে বাঁচার জন্য অর্থনীতির সামরিকীকরণ করা এখন সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ভারত সরকারের অর্থনীতির সামরিকীকরণের পিছনে পুঁজিবাদী সঙ্কট ও তা থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করার মূল উদ্দেশ্যটিও দেখিয়ে গিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। আর এই মূল উদ্দেশ্যটি আড়াল করে হতদরিদ্র দেশে এই বিশাল সামরিক ব্যয়কে যুক্তিসংগত করে দেখাতে চায় বলে সর্বদাই ভারত সরকার সীমান্তে উত্তেজনা জিইয়ে রাখে ও প্রয়োজনে পরিকল্পিতভাবে তা তুঙ্গেও তোলে।

এরই সঙ্গে যুক্ত আছে আরও দুটি দিক। প্রথমটি হল, দুর্নীতি। অস্ত্র কেনাবেচায় বিপুল ঘুষের কারবার আজ আর কারো অজানা নয়। এর পরিমাণ লাখ নয়, কোটি নয়, হাজার হাজার কোটি টাকা। বোফর্স কামান, জার্মান সাবমেরিন, তেহলকা কেলেঙ্কারি, কফিন কেলেঙ্কারি এই বিশাল দুর্নীতির ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। তবু সংবাদপত্রের প্রচারের ফলে এই দুর্নীতিগুলির কথা জনগণ কিছুটা জানলেও আরও কত দুর্নীতি যে থেকে যায় চোখের আড়ালে, তার ইয়ত্তা নেই। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল তাদের রিপোর্টে নৌবাহিনীর ৯ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা, পদাতিক বাহিনীর গোলাগুলি কেনায় ৪৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা, বিমানবাহিনীর বোমা কেনার ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার গরমিল উদ্‌ঘাটিত করেছে। এ ধরনের দুর্নীতির ঘটনা প্রচুর, যা ধরা পড়ে না বা ধরা পড়লেও ব্যাপক প্রচারে আসে না। বিশ্বজুড়ে অস্ত্রব্যবসায়ীদের কোটি কোটি টাকা ঘুষ ও লাভের কারবারের সঙ্গে শাসক বা হবু শাসক দলের নেতারা যুক্ত, বিশাল অঙ্কের যে টাকা নির্বাচনে ঢেলে বুর্জোয়া দলগুলি ভোটে লড়ে তার অনেকটাই এদের দেওয়া। এছাড়াও ভারত যেহেতু অস্ত্রক্রেতা হিসাবে বিশ্বের প্রথম সারির দেশ এবং ভারতের দেশীয় অস্ত্র কারখানাগুলিতেও প্রচুর সামরিক যন্ত্রাংশ আমদানি করা হয়, তাই আমেরিকা, পুঁজিবাদী রাশিয়া, ইজরায়েল, ফ্রান্স, ব্রিটেনের মতো প্রথম সারির অস্ত্রবিক্রেতা দেশের শাসকরা চায় ভারতের প্রতিরক্ষা খরচ বাড়ুক, তাহলেই তারা অর্ডার পাবে।

এবছর কেন্দ্রের কংগ্রেস জোট সরকার প্রতিরক্ষা খাতে মূলধনী ব্যয়, অর্থাৎ অস্ত্র কেনার জন্য বরাদ্দ অর্থ, গত বছরের সংশোধিত বরাদ্দ ২০,৯৫৩ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৩,৪৮৩ কোটি টাকা করে দিয়েছে, যা দিয়ে ইজরায়েল থেকে অত্যাধুনিক রাডার, ব্রিটেন থেকে জঙ্গি ট্রেনার জেট বিমান, রাশিয়া থেকে বিমানবাহী জাহাজ কিনবে ভারত সরকার। প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণববাবু বলেছেন, সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের জন্য আরও টাকা চাই। কারণ বিগত সরকার অস্ত্র কেনার যে চুক্তি করে গিয়েছে সেগুলি কিনতেই বর্তমান বরাদ্দ চলে যাবে। ভাবটা যেন, অস্ত্র কেনার চুক্তি যেহেতু পূর্বতন সরকার করেছে, তাই কংগ্রেস সরকারের কোন দায়িত্ব নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, ভোটে জনগণ যে তাদের জিতিয়েছে, তা কি বিজেপি'র চরম জনস্বার্থবিরোধী অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য? সেটা তো বিজেপি-ই করছিল। তাহলে তারা ক্ষমতায় গেলেন কেন ? সেটা কি, বিজেপি'র পরিবর্তে নিজেরা টাকা লোটার জন্য ? তা নাহলে তাঁরা চাইলে পুরনো অর্ডার যতদূর সম্ভব বাতিল করতে পারতেন? বিগত বাজেটে প্রতিরক্ষা বরাদ্দের একটা ভালো অংশ খরচ হয়নি অস্ত্র সময়মতো ডেলিভারি না পাওয়ায়। সেই টাকা দিয়েই তারা পুরনো চুক্তির দায় মেটাতে পারতেন। নতুন করে বাড়তি ১২ হাজার কোটি টাকা তাঁরা বরাদ্দ করলেন কেন?

বিপুল প্রতিরক্ষা ব্যয় যে অতীব দৃষ্টিকটু তা বুঝেই এর সমর্থনে নেমেছেন রাষ্ট্রপতি স্বয়ং। ইনি রাষ্ট্রপতি হলেও, ইনিই ভারতের পরমাণু বোমা তৈরির বিজ্ঞানবিষয়ক কর্ণধার। পূর্বতন সরকারের নির্দেশে ইনিই পোখরানে দ্বিতীয়বার পরমাণু বোমা পরীক্ষায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। এহেন যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রপতি বলেছেন — ''যদি অপরে আক্রমণ করে তবে তা ঠেকাবার শক্তি তো আমাদের অবশ্যই চাই।'' বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ ''যদি'' হয়, তবে ''এখনই'' অস্ত্রশস্ত্রে শান দেওয়া দরকার — এই তাঁর বক্তব্য। কিন্তু কোন দেশ যে ভারত আক্রমণ করবে এমন আশঙ্কা এখুনি কোথায়? তাছাড়া বর্তমানে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে এবং বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্কের কথা সরকার নিজেই বলছে। তার উপর নিছক সামরিক শক্তির বিচারেও প্রতিবেশী দেশগুলি ভারতের তুলনায় এতই দুর্বল যে তাদের দিক থেকে আক্রমণের কার্যত কোন সম্ভাবনাই নেই। পরমাণু শক্তি সহ ভারতের এই বিপুল রণসজ্জা সামরিক শক্তির আঞ্চলিক ভারসাম্য নষ্ট করছে — এটাই এখন ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিবেশী দেশগুলির অভিযোগ।এহেন অবস্থায় বৈদেশিক শক্তির আক্রমণের সরকারি জিগির আসলে মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে সরাসরি অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও প্রতিরক্ষা বরাদ্দবৃদ্ধির একটা রাজনৈতিক স্বার্থও রয়েছে। তা হল, ইঙ্গ-মার্কিন বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে যোগসাজসে আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি হিসাবে প্রতিবেশী দেশগুলির উপর ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখা। ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে আঞ্চলিক দাদাগিরি অব্যাহত চালানোর জন্য সামরিক শক্তিবৃদ্ধি করা শাসকদের পক্ষে অবশ্যকরণীয়। এজন্যই ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার পোখরানে প্রথম পরমাণু বোমা পরীক্ষা করেছিল; যার ধারাবাহিকতায় বিজেপি জোট সরকার পোখরানে দ্বিতীয়বার পরমাণু বোমা পরীক্ষা করেছে, বোমা ছোঁড়ার যোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র বানিয়েছে এবং সেজন্য প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়িয়েছে বিশাল। সেই ধারাবাহিকতাতেই বিজেপি'র পর নতুন কংগ্রেস জোট সরকার আবার লাফ দিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়াল। এর পিছনে বুর্জোয়াশ্রেণীর যে গভীর আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ আছে তা উদ্‌ঘাটিত করতে নারাজ বলে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থকেই দেশের স্বার্থ বলে চালাবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই সিপিএম বাজেটের অন্যান্য দু-একটি প্রশ্নের লোকদেখানো বিরোধিতা করলেও প্রতিরক্ষা খরচের বিপুল বৃদ্ধির নীরব সমর্থক।

মলানদিঘী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার দাবিতে বিক্ষোভ

বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরবর্তী অতি দরিদ্র মানুষ অধ্যুষিত কাঁকসা থানার মলানদিঘী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা ব্যবস্থা দীর্ঘ অবহেলার ফলে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি এলাকার গরিব মানুষের চিকিৎসার একমাত্র ভরসাস্থল। চিকিৎসা কেন্দ্রটির স্বাস্থ্য ফেরাতে এলাকার মানুষ 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি' গড়ে আন্দোলনে নেমেছেন। গত ১৫ জুলাই স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের সামনে প্রবল বর্ষার মধ্যে বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হন শত শত মানুষ। শাসকদলের নানা প্রলোভন এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করে আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও সোচ্চার প্রতিবাদ এলাকার মানুষের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। সংস্থার পক্ষ থেকে দু'হাজার মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র এদিন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতিনিধির মাধ্যমে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের উদ্দেশে প্রেরণ করা হয়। অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন নরেন রুইদাস, বারিদ রুইদাস, যুগল পাখিরা, দনা গোস্বামী, কল্পনা ব্যানার্জী প্রমুখ।

চা-শ্রমিক সংগ্রামে নতুন ধারা

একদিকে সরকারি ট্রেড ইউনিয়নগুলির আপসমুখিনতা, অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর উপর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি — এ অবস্থায় কী করবেন সাধারণ শ্রমিকরা? বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকরা বেছে নিয়েছেন সংগ্রামের নতুন পথ। নর্থ বেঙ্গল টী প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এই সংগ্রামের পথ দেখিয়েছে। তাদেরই আহ্বানে গত ১০-১১ জুলাই ডুয়ার্সের কালচিনিতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ডুয়ার্স ও তরাই-এর বিভিন্ন চা-বাগানের প্রায় দু'শ শ্রমিক প্রতিনিধি কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন। বন্ধ বাগানগুলোতে অনাহারে মৃতদের স্মরণে দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

কনভেনশন পরিচালনা করেন কমরেডস্ রামপ্রতাপ বড়াইক, লালকাঞ্চা লামা ও কাজী লামাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। খসড়া মূল প্রস্তাব পেশ করেন কমরেড গোপীনাথ ছেত্রী। প্রতিনিধিদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেন কমরেড গোপাল খেস। ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক, সম্পন্ন করা প্রভৃতি ৬ দফা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মূল প্রস্তাবে চা-শ্রমিকদের ওপর বর্তমান আক্রমণকে সারা দেশে উদারীকরণ ও সংস্কারের নামে শ্রমিকশ্রেণীর রোজগার ও অধিকারের ওপর যে সর্বনাশা আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে তারই অঙ্গ বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

কনভেনশনে স্থির হয় যে, ১৪ জুলাই চা-মালিকদের সর্বোচ্চ সংগঠন সিসিপিএ-কে এবং ২২ জুলাই জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনার, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও, জয়েন্ট লেবার কমিশনার, ডেপুটি লেবার কমিশনার ও অ্যাসিস্টেন্ট লেবার কমিশনারদের এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হবে যে, অবিলম্বে উপরোক্ত দাবিগুলি পূরণ না হলে শ্রমিকরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে পা বাড়াবে, প্রয়োজনে চা-শিল্পে ধর্মঘট এবং উত্তরবঙ্গ বন্ধের পথে যেতে বাধ্য হবে। এছাড়া এক লক্ষ চা-শ্রমিকের স্বাক্ষর সংগ্রহ, ৩১শে আগস্ট সঙ্কল্প দিবস পালন এবং সেপ্টেম্বরে কলকাতায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচি গৃহীত হয়।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অন্যতম সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা নর্থ বেঙ্গল টী

চা-শ্রমিক কনভেনশনে মঞ্চে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

কমরেড শঙ্কর গাঙ্গুলি সহ বিভিন্ন বাগানের প্রতিনিধিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশ নেন। তাঁদের সংযোজনী ও সংশোধনীর ভিত্তিতে মূল প্রস্তাব ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়।

কনভেনশনে গৃহীত মূল প্রস্তাবে অবিলম্বে বন্ধ চা-বাগানগুলির লীজ বাতিল ও সরকারি অধিগ্রহণ, সমস্ত চা-শ্রমিকদের নিয়মিত বেতন, রেশন, পানীয় জল, চিকিৎসা ও বিদ্যুৎ পরিষেবা সুনিশ্চিত করা, অবিলম্বে নতুন বেতন চুক্তি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড অচিন্ত্য সিনহা শ্রমিকশ্রেণীর রোজগার ও অধিকারের ওপর বর্তমান আক্রমণের প্রেক্ষাপট ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে সঠিক আদর্শ ও লাইনের ভিত্তিতে সচেতন, সংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। চা-শ্রমিকদের সাথে বৃহত্তর জনসাধারণের ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রবীণ পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

গত ১৪ জুলাই সন্ধ্যা ৭টা ৫মিনিটে এস ইউ সি আই মেদিনীপুর জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড শম্ভুনাথ মুখার্জী (ফুলদা) সুদীর্ঘকাল রোগভোগের পর মেদিনীপুর শহরে তাঁর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্রই মেদিনীপুর শহরে দলের কর্মী-সমর্থক-দরদীরা নারীপুরুষ নির্বিশেষে উপস্থিত হতে থাকেন। রাত্রি ৯-৩০টায় তাঁর মরদেহ নিয়ে শোকমিছিল কর্নেল গোলায় দলের কার্যালয়ে এসে পৌঁছালে সেখানে মাল্যদান করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান, লোকাল

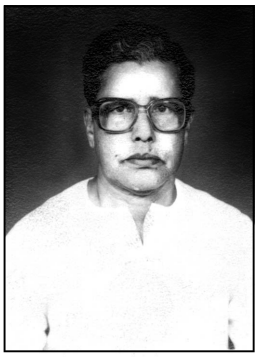

সম্পাদক কমরেড প্রাণতোষ মাইতি, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমল মাইতি, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সভানেত্রী কমরেড সুনীতা গুপ্তা, ডি এস ও-র জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত দাস, ডি ওয়াই ও-র পক্ষে কমরেড মানিক পড়্যা সহ শিক্ষক ফ্রন্ট, মেডিকেল ফ্রন্ট, সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট, রিক্সা চালক ইউনিয়ন প্রভৃতির পক্ষে অনেকেই। রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এবং জেলা সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসুর পক্ষ থেকে মাল্যার্পণ করা হয়।

মেদিনীপুর কলেজে পাঠরত অবস্থায় কমরেড শম্ভুনাথ মুখার্জী কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে গুরুতরভাবে শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় '৭৫ সালে তিনি কমরেড প্রভাস ঘোষের এক আলোচনার মাধ্যমে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। কমরেড শিবদাস ঘোষ '৭৬ সালে মৃত্যুর আগে জরুরি অবস্থার মধ্যে দলের কেন্দ্রীয় অফিসে মেদিনীপুর জেলার দলের কয়েকজন নেতা ও সংগঠককে নিয়ে যে সাংগঠনিক আলোচনা করেছিলেন সেখানে কমরেড শম্ভুনাথ মুখার্জী উপস্থিত ছিলেন। অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও কমরেড শম্ভুনাথ মুখার্জী প্রথম জীবন থেকে কুসংস্কার মুক্ত যুক্তিবাদী মন নিয়ে চলবার চেষ্টা করতেন। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলের কাজ করার শুরু থেকেই এই সংগ্রামকে মার্ক্সবাদের উন্নত উপলব্ধির দ্বারা চালিত করেছেন। দলের কাজ করতে গিয়ে পরিবার ও আত্মীয়দের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়েছে। দলের নীতি আদর্শে অবিচল থেকে তিনি আত্মীয়স্বজনদের জয় করার সংগ্রাম করে গেছেন।

মেদিনীপুর শহরে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। একটি দুটি কর্মী যখন এসেছে, তিনি অসীম মমতা ও স্নেহ দিয়ে মহান নেতার আদর্শে তাদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। দলের কাজে বিভিন্ন জায়গায় ছুটে যাওয়ার ক্ষেত্রে শয্যাশায়ী হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত শারীরিক অক্ষমতা তাঁর কাছে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। পাড়া-প্রতিবেশীর যেকোন সমস্যায় তিনি সহযোগী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন। গরিব মেহনতী মানুষের সংগ্রামকে শক্তিশালী করার প্রশ্নে সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছেন। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে মেদিনীপুর জেলা জুড়ে সংগ্রামী সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অসাধারণ। অ্যাসোসিয়েশন অফ অরথোপেডিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড্ সংগঠনের তিনি ছিলেন জেলা সভাপতি। নিজের ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধার জন্য নয়, সমগ্র প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারের কাছে আন্দোলন করে বেশ কিছু দাবি আদায়ের মাধ্যমে তিনি বহু সংখ্যক প্রতিবন্ধীকে সহায়তা করেছেন। এভাবেই তিনি সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের অতি আপনার জন হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও স্বার্থপরতার বর্তমান অবক্ষয়ী সমাজের পরিমণ্ডলে তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ কর্তব্যনিষ্ঠা এবং দৃঢ়চিত্ততার একটি অনুকরণীয় চরিত্র। দলের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য ছিল তাঁর অসাধারণ। মিতভাষী, স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মানুষটি সকলের কাছে ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়জন।

দীর্ঘদিন রোগশয্যায় থেকেও তিনি দলের কাজকর্মে সর্বদা খোঁজখবর নিয়ে পরামর্শ দিতেন, কর্মীদের মনোবল গড়ে তুলতে অনুপ্রেরণা যোগাতেন। তাঁর মৃত্যুতে পার্টি উন্নত মূল্যবোধ সম্পন্ন একজন কমরেডকে হারালো।

কমরেড শম্ভুনাথ মুখার্জী লাল সেলাম

কলকাতার জমির উপর খাজনা

এস ইউ সি আই-এর প্রতিবাদ

কলকাতা পুরসভা এলাকার জমির ওপর রাজ্য সরকারের চাপানো খাজনার বিরোধিতা করে এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী ২৪ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন —

''ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভা দফায় দফায় পুরকর প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও পুরপরিষেবার কোন উন্নতি ঘটেনি। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারও তার করণীয় কাজগুলিকে চূড়ান্তভাবে অবহেলা করেছে। নিকাশি খালগুলির সংস্কার, জরাজীর্ণ রাস্তাঘাট মেরামত, রাস্তার আলোর উপযুক্ত ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি অবশ্যকরণীয় কাজগুলি করে শহরকে বাসযোগ্য করার এবং দুর্নীতি দূর করে অর্থসঙ্কুলানের কোন চেষ্টাই তারা করেনি। তার ওপর বাড়তি ৪০ কোটি টাকা খাজনা চাপানোর এই জনবিরোধী সিদ্ধান্ত শহর থেকে গরিব ও মধ্যবিত্তদের হঠিয়ে প্রমোটাররাজ কায়েমের পরিকল্পনাকে সফল হতে সাহায্য করবে।

আমরা অবিলম্বে প্রস্তাবিত খাজনা প্রত্যাহারের দাবি করছি।''

স্বাস্থ্যকেন্দ্র তুলতে দেবেন না রঘুনাথপুরের মহিলারা

রঘুনাথপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ১২টি শয্যাই লোপাট হয়ে গেছে। রয়েছেন মাত্র একজন ডাক্তার ও একজন নার্স, বাকিদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের কোয়ার্টারগুলি পরিণত হয়েছে ভুতুড়ে বাড়িতে। খবর নিয়ে জানা গেল, সরকার এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ, এলাকার শত শত রোগীর একমাত্র ভরসা এই চিকিৎসাকেন্দ্রটি।

এই সংবাদে ক্ষুব্ধ কয়েকশ' মহিলা গত ১২ জুলাই মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃত্বে বি এম ও এইচ-কে ঘেরাও করে অবিলম্বে উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, ইনডোর বেড চালু, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাড়ি মেরামত ইত্যাদি দাবি করেন। তাঁরা ঘোষণা করেন, অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের পুরুলিয়া জেলার বিশিষ্ট নেত্রী ও স্থানীয় কাউন্সিলার কমরেড কালীদাসী কিত্।

একই দাবিতে ১৪ জুলাই পুরুলিয়া মহকুমা 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি' সি এম ও এইচ-এর কাছে ডেপুটেশন সংগঠিত করে। ডাঃ এন জি মুখার্জী, অনাদি নায়েক, আশুতোষ মেহেতা প্রমুখের আবেদনে সাড়া দিয়ে মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে স্থানীয় বহু মানুষ ডেপুটেশনে সামিল হন। ডেপুটেশনের আগে মিছিল ও পথসভা হয়। অধ্যাপক আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দশ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল সি এম ও এইচ-এর কাছে ডেপুটেশন দেন।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

গণদাবী ৩০ জুলাই, ২০০৪ ৫৭ বর্ষ / ১ সংখ্যা

রাজ্যে রাজ্যে মহিলাদের সংহতি সমাবেশ

‘‘মণিপুরের সংগ্রামী নারীরা, আমরা তোমাদের সাথে আছি’’

আসাম রাইফেলসের জওয়ানদের দ্বারা মণিপুরি মহিলা মনোরমা দেবীর ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসের অঙ্গ হিসাবে ১৯ জুলাই আসামের গৌহাটিতেও প্রতিবাদ মিছিল শহর পরিক্রমা করে। অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন এই প্রতিবাদের ডাক দিয়েছিল। ১৭ জুলাই সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদিকা ডাঃ এইচ জি জয়লক্ষ্মী এক বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বিচারবিভাগীয় তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এই দাবিতে ১৯ জুলাই রাষ্ট্রপতির কাছে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি চিঠিও পাঠানো হয়েছে।

আসাম ঃ ‘মণিপুরের সংগ্রামী নারীরা, আমরা তোমাদের সাথে আছি’ স্লোগানে এবং ব্যানার ফেস্টুনে সুসজ্জিত নারী মিছিল উলুবাড়ি, মণিপুর বস্তি, পল্টনবাজার, পানবাজার হয়ে ডি সি অফিসে পৌঁছায়। এই মিছিলে সামিল হয়েছিলেন গৌহাটির মণিপুরি বস্তির মেইরা পইবি উইমেনস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লিখিত স্মারকপত্র ডিসি’র হাতে অর্পণ করে নারীদের উপর সামরিকবাহিনীর অত্যাচার এবং মানবাধিকার লঙঘন বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।

পরে জজ ফিল্ডে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা চন্দ্রলেখা দাস (সভাপতি, এ আই এম এস এস, আসাম রাজ্য কমিটি); ইনা হুসেন (সম্পাদিকা, এ আই এম এস এস, আসাম রাজ্য কমিটি); চম্পা দেবী (সম্পাদিকা, মেইরা পইবি উইমেনস্ অ্যাসোসিয়েশন); এন সরোজিনী দেবী (সহ-সভাপতি, ঐ); এবং এন সি শ্রীবানি দেবী (বেলতলা, মণিপুরি উইমেনস্ অ্যাসোসিয়েশন)

ত্রিপুরা ঃ প্রবল বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে রাজধানী আগরতলাতে প্রতিবাদ মিছিল হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদিকা কমরেড শিবানী দাস।

মেঘালয় ঃ মনোরমা দেবীর ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে এবং দোষী সামরিক অফিসারদের শাস্তির দাবিতে এ আই এম এস-এর শিলং ইউনিট কর্তৃক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন কমরেড সঙ্গীতা চক্রবর্তী। দিল্লি, পাটনা, কটকেও এম এস এস প্রতিবাদ মিছিল করেছে।

গণরোষে উত্তাল মণিপুর

মণিপুর সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী এম কে গোবিনদাস ও ৮ জন বিধায়কের এক প্রতিনিধি দল ২২ জুলাই নিহত মনোরমা দেবীর বাড়ি গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন যে, আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট ১৯৫৮ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হবে এবং আসাম রাইফেলসকেও রাজ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। এই সরকারি প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ওঁরা মনোরমা দেবীর মৃতদেহ মর্গ থেকে নিয়ে আসার জন্য তাঁর পরিবারকে অনুরোধ করেন। কিন্তু মনোরমা দেবীর পরিবারের লোকজন ঐ প্রতিনিধি দলকে জানিয়ে দেন যে, আগে সরকার কালাকানুন প্রত্যাহার করুক, তারপর তাঁরা দেহ নিয়ে আসবেন। সাথে সাথে তাঁরা একথাও সাফ বলে দেন যে, প্রতিশ্রুতি পালন না করে মন্ত্রী ও সরকারি কর্তারা যেন ভবিষ্যতে ঐ পরিবারের কাছে না আসেন। এরপর পুলিশই মনোরমা দেবীর দেহ পুড়িয়ে দেয়, যার প্রতিবাদে মণিপুরে প্রবল গণরোষ আবার উত্তাল হয়েছে।

কটক

আগরতলা

পাটনা

গৌহাটি

ধর্ষণকারীর শাস্তির দাবিতে কোচবিহার আদালতে এম এস এস-এর বিক্ষোভ

কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি অঞ্চলের সিপিএম-এর অন্যতম নেতা যোগেশ বর্মনের ছেলে প্রদীপ বর্মনকে, ৮ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে গণবিক্ষোভের চাপে। সিপিএম নেতৃত্ব অপরাধীকে রক্ষা করার জন্য মেয়েটির বাড়ির লোকজনদের উপর চাপ দিয়ে যাচ্ছে, যাতে প্রদীপের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু মেয়ের বাবা ঐ চাপের কাছে মাথা নত করেননি। মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের স্থানীয় শাখা ঐ পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে মামলায় কারচুপির চেষ্টা বন্ধ করতে ১৭ জুলাই প্রদীপকে আদালতে তোলা হলে কমরেড ইন্দ্রময়ী দাসের নেতৃত্বে এলাকার মহিলারা আদালতের বাইরে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই সমবেত হন ও প্রদীপ বর্মনের শাস্তির দাবি তোলেন। বিচারক অভিযুক্তের জামিন নামঞ্জুর করেছেন।

বোম্বে হাইকোর্টের রায় চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক

— নীহার মুখার্জী

৩০ জুলাই, ২০০৩ বোম্বেতে একটি বন্ধ সংগঠিত করার জন্য দুটি রাজনৈতিক দলের ওপর ২০ লক্ষ টাকা করে জরিমানা ধার্য করার যে নির্দেশ বোম্বে হাইকোর্ট দিয়েছে, এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২৪ জুলাই এক বিবৃতিতে তাতে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

কমরেড মুখার্জী তাঁর বিবৃতিতে বলেন, শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান আক্রমণে সাধারণ মানুষের জীবন যখন চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত, তখন বোম্বে হাইকোর্ট সেই দুর্দশা লাঘব করার সামান্যতম প্রচেষ্টা করা দূরে থাক, বরং এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে লড়বার হাতিয়ারগুলিই জনসাধারণের কাছ থেকে কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে। যে বিচারবিভাগকে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বার্থরক্ষার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ভাবা হয়, কায়েমীস্বার্থের সঙ্গে হাত মেলাবার দ্বারা সেই বিচারবিভাগ তার নিরপেক্ষ চরিত্র অতি দ্রুত হারাচ্ছে। কমরেড মুখার্জী এই রায়কে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক এবং জনসাধারণের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন।

অবিলম্বে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক এই রায় বাতিল করার জন্য কমরেড মুখার্জী বোম্বে হাইকোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছেন এবং এই রায় বাতিলের দাবিতে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনগণকে আহ্বান করেছেন।

কমরেড নীহার মুখার্জীর চিঠি

একের পাতার পর

ভারতের এই নির্লজ্জ মার্কিন ঘেঁষা নীতির দ্বারা ইরাকের দেশপ্রেমিক জনগণকে ভারতের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করে তোলা হয়েছে, যার ফল হিসাবেই মার্কিন দখলদার বাহিনীর জন্য পরিবহনের কাজে নিযুক্ত তিন ভারতীয়কে অপহরণের সাম্প্রতিক ঘটনাটি ঘটেছে।’’

কমরেড নীহার মুখার্জী তাঁর চিঠিতে আরও বলেছেন, ‘‘আমরা দাবি করছি — ভারতের শান্তিপ্রিয়, গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন নাগরিকদের মতামতকে আপনার সরকার মর্যাদা দিক, মার্কিন পরিচালিত দখলদার বাহিনী এবং ইরাকের পুতুল সরকারের হয়ে যেসকল ভারতীয়দের কাজ করানো হচ্ছে, অবিলম্বে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হোক, দখলদার বাহিনী এবং তাদের তাঁবেদার ইরাক সরকারকে দেওয়া ভারতের যাবতীয় সাহায্য-সহায়তা ও পরিষেবা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক।

‘‘আপনার সরকারের কাছে আমাদের আরও অনুরোধ যে, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে ও ইরাক থেকে দখলদার সেনা প্রত্যাহার করতে মার্কিন সরকারকে যেন ভারত সরকার বাধ্য করে। দখলদারদের হঠিয়ে মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য ইরাকের স্বাধীনতা যোদ্ধারা যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করছেন, তার পাশে সর্বাত্মকভাবে দাঁড়াবার জন্যও আপনার সরকারের কাছে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি।’’

৫ আগস্ট উপলক্ষ্যে

গণদাবী’র

বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net